স্বপ্ন টুকু থাক আকাশের ঠিকানায়

হাবিবুর রহমান

আলাবালা বেশে কিছু উল্টপাল্ট রাগী কালো যুবক চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি, হাতে দাঁপিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটি মেয়েকে। আশপাশের মানুষ ভয়ে জড়োসরো। তটস্থ। এলাকার পরিবেশ বিপর্যস্ত। যেন এক পাল শকুন ভাগাড়ে হামলিয়ে পড়েছে মরার উপর। কিন্তু ভাগাড়ের মরা ভেগে গেছে। শকুনের বিশ্রী কর্কশ ডাকে আর রাগী পাখা ঝাপ্টানোর তোড়ে ভাগাড় এলাকা তোলপাড় হয়ে যায় যেমনি। ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে এই লোকালয়টির।

লোকালয়টির একটি বর্ণনা দেয়া যাক এমনভাবে। এটি হলো একটি ওয়ারহাউজ সিটি। বিশাল বিশাল ওয়ার হাউজ দাঁড়িয়ে আছে সারিসারি। অদুরে কন্টেইনার ইর্য়াড। গলাগলি সখ্য তায় সাগর দর্শনে উর্ধ্ব মুখী। সমুদ্র বন্দর এলাকায় এধরনের ছবি যে কোন শিল্পবন্দর নগরীতে পাওয়া যায়। তবে এখানকারটা একটু ভিন্ন ধরনের। এ ওয়ার হাউজ সিটিতে মুদির (ব্যবস্থাপক) ছাড়া স্থানীয় (লোকাল) লোকজন নেই বললেই চলে। সব ওস্মানলই (শ্রমিক) আজনবী (বিদেশী টিসিএন)। "ওস্মানল", আজনবী, "মুদির" ইত্যাদি শব্দগুলো এখন বাংলা ভাষায় আত্তীয়করণ হয়ে গেছে তবে দলীয়করণ নয়। সংগত কারনেই এ শব্দগুলি বক্ষমান গল্পে ব্যবহৃত হবে। আদৌ যদি কাহিনীটি গল্প হয়ে উঠে।

আমি এ বিশাল ওয়ার হাউজ সিটির একটি বড় কন্টেইনার ইয়ার্ডে কাজ করি। দীর্ঘ কুড়ি বছর কাজ করেছি এখানে। ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়ে ছিলাম নিজ দেশে। কোম্পানী আবার ডেকে এনেছে তাদের প্রয়োজনে। এবারে বাড়তি লাভ হয়েছে। দুটি এ্যাসিসট্যান্ট পেয়েছি। তারা কেউ আমার স্বজাতি নয়। স্বদেশী তো নয়ই। কেরেলার- ইন্ডিয়ান। কেরালাইটদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট আমি লক্ষ করেছি। একজন কেরালাইট হলে মুখ বুজে কাজ করবে সর্বক্ষণ। আর আপনার পায়ে পায়ে ঘুরবে। আর দুজন হলে সারাক্ষণ কাজ করবে আর কথা বলবে নিজেদের মধ্যে। তিনজন হলে চেষ্টা করবে কিভাবে নতুন একজন কে আনা যায়। চারজন হলেই ষড়যন্ত্র শুরু করে দিবে কি করে আপনাকে আউট করা যায়। চাকুরি জীবনের প্রথম অবস্থায় এক কেরালাইটকে খুব ভাল জানতাম। বলাবহুল্য আখেরে সে আমার ক্ষতি করেই গেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমিও তক্কে তক্কে আছি। এদের আউট করে কিভাবে দেশিভাই আনা যায়।

বেশ কিছু কন্টেইনার এসেছে ফিনিসড্ গুডস্ নিয়ে। এক্সপোর্টের অপেক্ষায় আছে। রো রো ভেসেলে করে এগুলি পাড়ি দিবে সমুদ্র, পৌছবে বিভিন্ন দেশে। কাষ্টমস্ ক্লিয়ারেন্সও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আমি ভীষন ব্যস্ত। নিষিদ্ধ ড্রাগসের বেচাকেনার ব্যাপারে কাষ্টমস্ অফিসাররা আজকাল খুব সজাগ। একটি কন্টেইনার খোলে ওস্মানল দুজন অফিসারদের দেখাচ্ছে। ডকুমেন্টস হাতে আমি পাশে। আমার পাশ দিয়ে দ্রুত হেটে যাচ্ছে এক বঙ্গ সন্তান। পিছন ফিরে দেখি চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ডাকলাম জোরে।

একটু শুনুন দেশী ভাই।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে এলো আমার কাছে।

আরে হুজ্জুত আলী না ! তুমি কোত্থেকে? এখানে কি করে?

আপনে আমারে চিনছেন কেরামত ভাই?

চিনবোনা কেন ! অবশ্য ই চিনেছি। তুমি খুব বুড়িয়ে গেছ।

এই যা তফাত। তাহলে ও চেনা যায়। তা এখানে এ বিদেশ বিভুঁইয়ে?

কেন আবার! প্য াটের ধান্ধায়। শুধু আমি না । আমার একটা ছেলেও আছে।

সে কোথায়?

সবই বলবো কেরামত ভাই। আপনাকে যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না।

ওদের বিদায় করে নিই। তারপর কথা হবে। তুমি ঐ কন্টেইনারের চিপায় যেয়ে বস ।

হুজ্জুত আলীকে বসিয়ে তাড়াতড়ি কাজে মন দিলাম। মনের ভিতর গুন গুনাতে শুরু করলো অতীত। আমার বাবা যখন আমাদের পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাস্টার, তখন এই হুজুত আলী ছিল ডাক পিয়ন। তখন সে ছিল যুবক। সবে বিয়ে করেছে। সব সময় হাসিখুশি । হাটবার এলেই আমাদের হাত ধরে নিয়ে যেত হাটে। মদন মুরলী, নিমকিভাজা, আর ফুটকলই খাওয়াতো। মা বকত। কিন্তু আমরা ফুটকলই ভাজার লোভে হুজ্জুত আলীর পিছ ছাড়তাম না। সেই হুজ্জুত আলী আমার সামনে ! কি আশ্চর্য ব্য াপার ! বিশ্ব াস হতে চায় না। কাষ্টমস্ অফিসারদের বিদায় নিতে নিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। কন্টেইনার বন্ধ করে সেফ্টি লক লাগিয়ে ওস্ম াল দুটোকে চারদিকে নজর রাখতে বলে হাঁটা দিয়েছি। সামনে দেখি হুজ্জুত আলী। ভয় ছিলো এতো দেরী দেখে পাছে লোকটা চলেই যায় কিনা বিরক্ত হয়ো না । হুজ্জুত আলীর চোখে মুখে কোন বিরক্তির ছাপ নেই। আছে শুধু শূন্য তা।

এবার হুজ্জুত আলী বল তোমার খবর।

আমার অফিসে এসে জুত করে বসে কথাটি ছুড়ে দিলাম ওর দিকে।

চারদিক দেখতে দেখতে হুজ্জুত আলী বসে পড়লো সামনের চেয়ারটিতে। কিন্তু মুখে কোন রা নেই। তাড়া দিতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল কেরামত ভাই আপনি কি খুব ব্য স্ত ?

না। বলতেই বললো।

তাহলে চলুন না আমার সাথে একটু।

কোথায়?

আসুনই না।

বলতে বলতে হুজ্জুত আলী আমাকে প্র ায় জোর করে ধরে নিয়ে চললো। মেইন রোডের ওপাশে একটু উঁচুমত জায়গায় কটি আদিম কালো তাকরুনী মেয়ে কি সব পশরা সাঁজিয়ে বসে আছে। কাছে যেয়ে দেখি ওরা খাবার বিক্রি করছে। ঝাল গরু কিংবা খারোপ (ভেড়ার) বা গানম (ছাগল) এর মাংস, হাতে বানানো আটার রুটি।

এখানে কেন নিয়ে এলে হুজ্জুত আলী ? এই তাকরুনীদের আড্ডয়?

দাঁড়ান না একটু। দাঁড়ান প্লি জ।

বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে দেখলাম। এ সমস্ত রোডে সাধরণত মালবাহী লরি ও ট্রে লার চলে। ট্রে লারে কখনো থাকে কন্টেইনার কখনো অন্য মাল। যখন গম বা চালের চলাচল চলে তখন রাস্তার দুপাশে চাল গমের ছড়াছড়ি। বৃদ্ধা ও ছোট ছোট তাকরুনী মেয়েরা কোন্ডট্রি ঙ্ক স্ এর ডাব্ব ার সাথে সাথে চাল ও গম কুড়ায়। ঐ গম পিশে আটা তৈরী করে, তার থেকে হয় রুটি। গরু ছাগল যখন বন্দরে যা আসে তখন ব্য াড হ্য ান্ডে লিংয়ের কারণে অনেকের পা ভেঙ্গে যায় বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হলে ড্র াইভাররা সস্তায় বেঁচে দেয় এ সমস্ত পশু তাকরুনী যুবকদের কাছে। তাই ওদের রুটি মাংস খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

আমাকে রেখে হুজ্জুত আলী সে যে গেল আর আসার নাম নাই। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকরুনীদের কায়কারবার দেখছি আর ভাবছি হুজ্জুত আলী গেল কোথায়? অনেক্ষন পর দেখি নীচের খাদ থেকে উঠে আসছে হুজ্জুত আলী সাথে একটি ছেলে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। এই আমার ছেলে। চাচারে সালাম কর। আট দশ বছরের একটি বালক। চমৎকার একটি জিন্সসের হাফ প্য ান্ট পরে আমার সামনে। গায়ে একটি চক্কর বক্কর স্য ান্ডো গেঞ্জি।

কিরে? কি নাম তোর ?

বাপের দিকে তাকিয়ে ফট করে নামটি বলে ফেললো।

রুস্তম।

বাহ! সুন্দর নাম তো। তোরা দেখছি সোহরাব রুস্তমের কাহিনী হয়ে গেলি। কাহিনীটি কি? জানার জন্য হুজ্জুত আলীর মুখের দিকে তাকাতেই সে বুঝে ফেললো আমার ইরাদা। আমি ওদের এদেশের আগমনের হেতু বুঝতে পারলেও বিত্তান্ত শুনার জন্য অপেক্ষার দৃষ্টি মেলে তাকালাম। হুজ্জুত আলী শুরু করলো এভাবে।

আপনার আব্ব া রিটায়ার্ড করার পরও আমি অনেকদিন ছিলাম চাকুরীতে। আপনার আব্ব া চাকুরী করতেন সখে। আর আমি করতাম জীবিকার প্র য়োজনে। চাকুরীর শেষ জীবনে এসে দেখি আমার ঘর অন্ধকার করে আছে চার চারটি সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে। আর তিনটি অগন্ড ছেলে। যাদের নাক দিয়ে হিঙ্গে ল পড়ে। তার মধ্যে শেষেরটা একেবারে গেদা। মায়ের মাই চুষে। এ অবস্থায় যখন রিটায়ার্ডের ঘন্টা বাজা শুরু হলো তখনই উত্তর চকের বড় ক্ষেতটা বিক্রি করে বড় মেয়ের বিয়ে দিলাম বেশ ঘটা করেই। বাকী তিনটিকে বিয়ে দিতে উত্তর চকের আমার তিনটা ক্ষেতই চলে গেল। আপনি তো জানেন কি সুন্দর সরষে আর রবিশষ্য হতো। ধানের মৌ সুমে আউশে আমনে ভরে যেতো ক্ষেত। হুজুত আলীর বর্ণ নার সাথে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো হলদে উত্তর চক আর সবুজের প্র াচীর। আমাদের আম বাগানের পিছনের উত্তর চক। একটু থেমে হুজ্জুত আলী বলা শুরু করলো।

“ রহমতের দরিয়া” ট্র াভেল এজেন্সীতে শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে টাকা জমা দিলাম। আদম বেপারী বললো শেখের বাড়ীতে তুমিও তোমার ছেলে ফাইফরমাশ খাটবে, টুকটাক কাজ করবে, ভালই চলে যাবে তোমাদের।

তাদের কথায় বিশ্বাস করে ঢাকা-বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করে তারপর একদিন নাচতে নাচতে এয়ারপোর্টে বিমানে করে এই শহরে।

কেরামত ভাই কি বলব আপনারে, শেখের বিরাট বাড়ী। রাজপ্রাসাদ। আমাদের জায়গা হলো সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। ফিলিপিনী, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানী, ইন্ডিয়ান, সুদানী, ইয়েমেনী সব মিলিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে যেন ছোট একটি জাতিসংঘের সদর দপ্তর।

তারপর!

তারপর এক লম্বা কাহিনী। শুনতে চাইবেন না। কষ্ট পাবেন।

শুধু জাইনা রাখেন, বাপ বেটার হাড্ডি কয়খান বাইচ্যা আছে। তারপর এক পাকিস্তানীর বুদ্ধিতে এইখানে। ওরা আবার এইগুলি। খুব ভালো জানে। আইস্যা দেখি আমাদের মত আল্লাহ কফিলের ওস্মাল আরো অনেক আছে। ঐ যে খাদটা দেখলেন না ? ওটা কিন্তু গভীর খাদ। একবার নামলে উঠা যায় না। আর উঠলে নামা যায় না। ঐখান থেকে কাউকে ধরতে পারবে না মরুর বা জাওয়াযাত।

কফিলের অত্যাচার তো নতুন কিছু না। এ সবতো এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। এই জন্য তো কেউ কাজ ছেড়ে ভাগে না। আসল কাহিনীটা কওতো হুজুত আলী।

আমি কাহিনীর গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। দম নিয়ে হুজুত আলী শুরু করে।

আমার ছেলেটাকে তো দেখছেন ভাই। দুধের বাচ্চা। শেখে ওরে আনছে উটেরে জকি বানানোর জন্য। আমারে সাথে আনছে যেন কেউ কিছু না বলতে পারে। এ দেশে আসার পরই ব্যাপারটা জানতে পারলাম। উট দৌড়ের জকিরা যদি উটের পিঠ থেকে পড়ে যায় তাহলে আর কেউ বাঁচে না। উটের পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। আমার তিন ছেলের মধ্যে এটা আবার আমার বেশী বেশী ন্যাউটা। আমারে ছাড়া কিছু বুঝে না। রাতে ঘুমায়ও আমাকে জড়িয়ে। ওর টানেই আমার বিদেশ আসা।

তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পাকিস্তানীর সাহায্যে এই দুর্গম আউটল এরিয়া তোমার আগমন। তাই না ? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। পাকিস্তানীরা আবার এই সমস্ত ফন্দিফিকির আটঘাট ভাল জানে। এসে দেখি আমার মত আরো অনেকে আছে। কেউ ভিজিট ভিসা, কেউ কফিল থেকে ভেগে এসেছে আরো অনেক কারণে। তবে বাঙ্গালীদের মধ্যে চুরি জুচ্চারি, ছিনতাই, রাহজানী, মারামারী করে ভেগেছে এমন কেস নাই। আসলে কি জানেন ভাই, বাঙ্গালীরা নিরীহ কোন ক্যাচালের মধ্যে নাই। শুধু ভাতের জন্য এ মরু দেশে।

আমি ওকে নষ্টালুক হতে দেই না। টেনে নিয়ে আসি বর্তমানে। চারদিকে উঁচু পাহাড় ঘেরা এই বিস্তীর্ণ এলাকটিতে আগে ছিল পাহাড় ক্রাসিং প্লান্ট। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে সেই পাথর দিয়ে সী পোর্টের কন্সট্রাকশানের কাজ হতো। সে বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন মাঝে মধ্যে পাহাড়ের চিপায় লাশ পাওয়া যেত। এখন অবৈধ

ওস্ম ালের আনাগোনায় খুন খারাবির মত অপরাধ কমে গেছে। বাড়ছে অন্য ধরনের অপরাধ। এই যে দেখছেন তাকরুনী মেয়েরা খাবার বিক্রি করে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে খুব ভাল।

রুস্তম কে দেখিয়ে বলল।

ওকে খুব ভালবাসে মেয়েটা।

খালায় আমাকে খাওন দেয়। আমি খালার সব কাজ করে দিই।

রুস্তম উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো।

দেখতো তোর খালায় কই।

রুস্তম কে সরিয়ে দিয়ে হুজ্জুত আলী শুরু করল পুনরায়।

এই তাকরুনী মেয়েগুলো এমনিতে খুব ভাল। দিনভর পরিশ্র ম করে। খাবার তৈরী করা, বিক্রি করা। এছাড়া এটা সেটা যখন যা পায় সে ধান্ধায় লেগে থাকে। এখানে যত ওস্ম াল দেখছেন এরা সবাই অবৈধ। আল্ল াহ এদের কফিল। পুলিশও জানে। কিন্তু কিছু বলে না। কারণ এই বিশাল ওয়ার হাউজ সিটিতে এদের দ্ব ারা কাজ করায় মুদিররা খুবই

সস্তা পারিশ্র মিকে। সবচেয়ে বড় কথা এসব ওস্ম ালরা কোন গন্ড গোল করে না। প্র চন্ড গরমে এসি ছাড়া কাজ করে মুখ বুঁজে। এরাই তাকরুনীদের খদ্দের। খদ্দের দিনের বেলার না। খদ্দের রাতের বেলারও। রক্তকে রক্ত বলা ভুল। রক্তের ভেতর থেকে যদি ধুঁয়া বের না হয়। রক্তের ভেতর যদি উথাল পাতাল ঢেউ না উঠে তাহলে কিসের রক্ত? সেতো পানি।

আমি নিষিদ্ধ গল্পের গন্ধ পেয়ে পুলকিত হই। সামনে টুলটায় একটু নড়েচড়ে বসেই হুজ্জুত আলীর দিকে তাকাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। ইশারায় অভয় দিলে বলি। বলে যাও।

লাজুক গোধুলিতে লজ্জা ঝেড়ে হুজ্জুত আলী বলতে লাগে এক নিষিদ্ধ আদিম কাহিনী।

পাহাড়ের মাঝে মাঝে টিনসেডের যে সমস্ত ক্য াম্প গুলি (এ্য াকোমোডেশন) দেখছেন। এ সব গুলিতে থাকে হলো ক্লি নাররা। ওরা বেতন পায় ৩/৪ শত টাকা (স্থানীয় মুদ্র া)। একরুমে থাকে ২০/২৫ জন। একটা মাত্র এসি। থাকা কোম্প ানীর খাওয়া নিজের। নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগেই থাকে। কোন চিত্তবিনোদনের ব্য বস্থা নাই। মারামারি ঝগড়াঝাটি ওদের বিনোদন। যাদের মাল পানি আছে তারা ভি সি আর ব্লু ফ্লি ম দেখে। এব্য াপারগুলি ওদের কাছে ওপেন সিক্রেট। কোন লজ্জা শরমের বালাই নেই। এদের এই মানসিকতার সুযোগ নেয় ঐ সমস্ত তাকরুনী যুবতীরা। বিস্যু ৎবার শুক্রুবার কালো বু পের হাট বসে পাহাড়ের আড়ালে আবডালে, শেডের পিছনে এখানে সেখানে। দুর দুর থেকে লিমুজিনে করেও কালো মেয়েরা আসে। পার শর্ট রিয়ালিন রিয়ালিন।

স্য রি কেরামত ভাই পঁচা কথা বলে ফেললাম।

জীবনটা বার বার মুছে যেতে চায়। কে যেন ইরেজার দিয়ে ঘষে ঘষে জীবনটা মুছে দিতে চায়। আমি ভাবছি এর ভয়াবহ পরিণতির কথা। ওরা কি জানে না কি ভয়ংকর মৃত্য র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ তরুন সমাজ। শুধু একটুখানি জৈবিক উত্তেজক আনন্দের জন্য ডেকে আনছে ঘাতকব্য াধি এইডসকে। হায়রে বাঙ্গালী ! দেশে মরে না খেয়ে বিদেশে মরে এইডসে আক্রান্ত হয়ে। অজান্তেই একটি ভারী দীর্ঘ শ্ব াস পড়লো আমার। চমকে হুজ্জুত আলী জিজ্ঞেস করল!

কি ভাবছেন কেরামত ভাই?

কিছু না, বল।

সবাই যে এরকম তা নয়। ঐ যে দেখছেন মেয়েটা রুস্তমের খালা ও ঐ রকম না। ওর মত আরো অনেক আছে যারা গতর বেচে খায় না।

কই তাকে তো দেখলাম না।

হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসল রুস্তম। আব্বা খালারে পাওয়া যায় না। কই গ্যাছে কেউ জানে না। সকাল থেকে সবাই খুঁজছে, পায় না। কি হবে আব্বা?

বলেই ভ্যাঁ করেই কেঁদে উঠলো ছেলেটি।

তাই তো !

হুজুত আলী ও দেখছি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

গ্যাছে কোন ধান্ধায়, টেনশেন করো না ।

এসে পড়বে।

এদিকে রাত ঘনিয়ে এলো।

আমি যাই।

বলতেই হুজুত আলী আমার হাত ধরে বললো

একটু দাঁড়ান।

কে না কে নিখোঁজ হয়েছে, তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

কেরামত ভাই জিউল মাছের ঝোল আর বিরুই চালের ভাত, বউয়ের হাতের রান্না। সে তো কবেই ভুলে গেছি। ঐ মেয়েটার কাছ থেকে তো বেঁচে থাকার রসদ আর মাথা গুঁজার ঠাঁইটুকু জুটতো। কি হবে কেরামত ভাই?

" কৃষ্ণকলি আমি তাকেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক" । আমার ভেতর গুন গুনায় রবীন্দ্র নাথ। হুজুত আলীর সমস্যা আমি বুঝিনা। বা বুঝার চেষ্টা করি না। আমি ভাবছি হুজুত আলী আর তার ছেলেকে যদি ক্যাজুয়াল হিসাবে আমার ওখানে লাগাতে পারি, তাহালে আস্তে আস্তে কেরালা দুটোকে বিদায় করা যাবে। ছেলেটাকে লাগিয়ে দেব অফিস বয়ের কাজে আর ওর বাপটা থাকবে ওম্মাল দুটোর সাথে। বুদ্ধিটা মন্দ না। কালই মুদিরকে বলতে হবে। বাপ বেটার খাওয়া হয় নাই। রাতে থাকবে কোথায় তারও নিশ্চয়তা নাই। ৫০টি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা) দিব কি হুজ্জুত আলীকে? কাজটি পেলে হুজ্জুত আলী বেঁচে যায়। বউয়ের কাছে চিঠি লিখবে " মাষ্টার সাহেবের বড় ছেলে কেরামত মিয়া আমাকে চাকুরী দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, থাকতে দিয়েছে" । দেশের মানুষ আমার প্রশংসা শুনবে। আমার নাম ডাক হবে। দেব কি ৫০টি টাকা ? এক লহমায় হিসেব করে ফেলি। ৫০ টাকা দিলে আমার কি অসুবিধা হবে। বাজেটে টান পড়বে কিনা? আমাকেও তো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আবার নাম ডাক খ্যাতির মোহ তাকেই বা ছাড়ি ক্যামনে ! মনস্থির করেই ফেললাম। হুজুত আলীর হাতে ৫০টি টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, আজ রাতটা কোনমতে কাটাও। কাল সকালে দেখা কর, দেখি কি করতে পারি।

ভারিক্কি চালে কথা কটি বলেই হাঁটা ধরলাম নিজ আস্তানার দিকে। রাতের তারাভরা আকাশ। চাঁদের বুকে এবড়োথেবড়ো আঁকিবুকি। সত্যি ই যেন ঝলসানো রুটি। খা খা জ্যো ৎস্নায় সুরমা রংয়ের পাহাড়গুলি চক্ চক্ করছে। হুজ্জুত আলীর মাথার উপর চাঁদ আছে ছাদ নেই। এই বেআব্রু

চন্দ্র লাঞ্ছিত রাতে ওদের আব্রু রক্ষা হবে কি ? বাপ বেটা পাবে কি রাতের মত আশ্র য়? একবার ভেবেছিলাম ওদের আমার পোর্টা কেবিনে নিয়ে আসি। উটকো ঝামেলায় আমার বিশ্র ামের আলস্য নষ্ট হবে। তাই এই বদান্য টুকু দেখাতে কার্প ন্য করেছি।

আমাকে সবাই ভাল বলে, সত্যি ই কি আমি ভাল ? খারাপ হওয়ার সুযোগ পাইনি। তাই কি ভাল? আকাশের নীচে হাঁটছি। কিন্তু আকাশের মত উদার হতে পারছি কই? রুস্তম হয়তো কোন তাকরুনী যুবতীর পলিথিনের ঝুপড়ির দরজায় আঘাত করছে আর খালা খালা বলে চিৎকার করছে। হয়তো সে ঝুপড়িতে কোন কালো সুন্দরী খদ্দেরের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। মাথার উপর নীলাকাশ। পায়ের নীচে শক্ত কাঁকড়মাটি। আমার শীতাতপ পোর্টা কেবিনে নরম বিছানা।

কেরামত সাব, ইধার আইয়ে, দেখিয়ে কিয়া হাঙ্গা মা হুয়া। কিয়া হুয়া ভাই?

কিউ চিল্ল াতে হু ?

আমি এগিয়ে যাই আমার কেরালার ওস্ম ানদের কাছে। একটি ২০ ফুট ছোট কন্টেইনারের মুখ খোলা। ভেতরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে।

যাও পাকাড়কে লে আউ।

বীরপুঙ্গ বের মত হুকুম চালাই আমি। ওরা দুজন দুহাত ধরে টেনে মেয়েটিকে বের করে নিয়ে আসে। বাইরে এসেই চাপাতির মত ঝিলিক দিয়ে উঠে হালকা পাতলা মেয়েটি উলঙ্গ চন্দ্র ালোকে। এক ঝট্কায় হাত দুটি ছাড়িয়ে ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে দাঁড়ায় কফি কালারের মেয়েটি। চাইনিজ কুড়ালের মত গলাটা টং করে বেঁজে উঠে।

আমি ব্রে াথেলে যেতে চাই না।

‘ ‘ আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়’ ’ । পাহাড় যেন দুহাত বাড়িয়ে অসহায় মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে চায়। পদ্ম ার ইলিশের মত বাতাসের উজাঁন ঠেলে মেয়েটি সাঁতরিয়ে পাড় হতে চায় অমাবশ্য া সাগর দুর আকাশের কিনারায়।

যেখানে মেঘ বলে যাব যাব, বৃষ্টি বলে ভিজিয়ে দিব।

০৫-০৮-২০০৪ইং

জেদ্দা।

_E-mail: habib_azad2000@yahoo.com_

habibr@savola.com